রশীদ জামীল

মমাতি

(অভিশপ্ত এক জাতি)

মমাতি

(অভিশপ্ত এক জাতি)

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 9, UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 919 248 0

Momati
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

বই আকারে কিছু একটা লেখা শুরু করতেই বইয়ের একটা নাম ঠিক করে ফেলি। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাপা হওয়ার পর মলাটে সেই নাম আর থাকে না। নাম পালটে যায়। *মমাতি* পালটায়নি। *মমাতি* নামে শুরু, এ নামেই প্রকাশ। নামের এই স্থায়িত্বের পেছনে আছে কয়েক মিনিটের একটি ইতিহাস।

আমাকে যারা জানেন, তারা জানেন আমি রাতজাগা পাবলিক। লেখালেখি যেটুকু করি, রাতে করি। রাত যত গভীর হয়, লিখতে ভালো লাগে। যদিও জানি রাতজাগা গর্বের ব্যাপার না। অবশ্যই একটা বদ অভ্যাস।

সেদিন ইশার নামাজের পরপরই ঘুমিয়ে পড়ি। আগের রাত ও সারা দিন একটুও ঘুমানো হয়নি। সংগত কারণেই কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল! তাকালাম ঘড়ির দিকে। রাত ১২টা বেজে ৪৪ মিনিট। সিদ্ধান্ত নিলাম *মমাতি* *মমাতি* নামেই প্রকাশিত হবে। নাম নিয়ে আর কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না।

আমার আব্বা মারা গেছেন ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে। আমার একটিমাত্র বই হাতে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেই স্মৃতিকথা অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি। আমার প্রথম বই *বিবেকের পিঠে চাবুকের আঘাত* বেরোনোর পর আব্বার প্রাত্যহিক রুটিন ছিল, বইয়ের একটি কপি হাতে নিয়ে বের হওয়া, বন্ধুবান্ধব, আলিম-উলামা যার সঙ্গেই দেখা হোক, বই থেকে কয়েক লাইন পড়ে শোনানো এবং বলা—'কথাগুলো অসাধারণ না?'

লেখা যা-ই হোক, শ্রোতা যে-ই হন, (ভদ্রতার খাতিরে হলেও) বলতেন, 'হ্যাঁ।' আব্বা তখন বলতেন, 'আমার ছেলে লিখেছে...।'

সে রাতে বাবার সঙ্গে দেখা হলো আমার। আমার মনে হলো, তিনি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন আমরা তাঁর কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। দেখলাম, হেঁটে হেঁটে আমার দিকেই আসছেন। বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আমি। কাছে এসেই বললেন, 'কিতা খবরায় বাবা?'

কেঁদে ফেললাম আমি। আব্বা যখন প্রচণ্ড আবেগে আন্তরিক হতেন, তখনই আমাকে এভাবে সম্বোধন করতেন। শেষবার, বছর ছয়েক আগে আমাকে 'বাবা' বলে ডেকেছিলেন। অবশ্য সেদিনের 'বাবা'য় একটু ক্ষোভও মেশানো ছিল। ঘটনাটি ছিল এমন—

সিলেটের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান রানাপিং মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম শায়খ রিয়াছত আলি রাহ.-এর স্মৃতি সংরক্ষণে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। শায়খের ছেলে ইলিয়াস ভাই এসে আমাকে ধরলেন। তাঁকে আমার হাওলা করে দিয়েছিলেন আমার দীক্ষাগুরু মরহুম মাওলানা নেজাম উদ্দিন রাহ.। ইলিয়াস ভাই এসে বললেন, স্মারকটি আপনি সম্পাদনা করে দেবেন। আপনার পক্ষে 'না' বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, সম্মতি চাওয়া হচ্ছে না।

ইলিয়াস ভাই এভাবে বলার সুযোগ পেয়েছিলেন—কারণ, তিনি জেনে গিয়েছিলেন আমার আব্বা ছিলেন তাঁর আব্বার প্রিয় ছাত্র। আর তিনি ঠিকই জেনেছিলেন। ছোট থেকে বড় হওয়ার পথে আব্বার মুখে যতবার 'চকরিয়ার ছাব, চকরিয়ার ছাব' শুনেছি, আমার জীবনে তাঁর মুখে অন্য কারও কথা এতবেশি শুনিনি। (শায়খের গ্রামের নাম চৌঘরী। কথ্য ভাষায় চকরিয়া। তাই সবার কাছে তিনি ছিলেন চকরিয়ার ছাব।)

কিছুদিনের মধ্যে ইলিয়াস ভাই অনুমান দেড় ফিট বাই তিন ফিট সাইজের ব্যাগে করে আধা ব্যাগ পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলেন। আক্ষরিক অর্থেই আধা ব্যাগ ছিল! আমার মাথা চক্কর দিতে আরম্ভ করল। ভয়ে ভয়ে ব্যাগ খুললাম এবং রীতিমতো ঘামতে লাগলাম। বিভিন্ন সাইজের সাদা কাগজে, রোল করা কাগজে, বাদামি রঙের ডোঙা কাগজে এবং 'বাই এয়ার মেইল' লোগো-সংবলিত চিঠির খাম থেকে গাম ছাড়িয়ে উভয় পৃষ্ঠায় হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির স্তূপ! আর লেখার স্টাইল...আমার ধারণা ছিল আমার থেকে জঘন্য হাতের লেখা আর কারও হতেই পারে না। আমি ভুল প্রমাণিত হলাম।

লেখাগুলো সম্পাদনা করে কম্পোজিংয়ে পাঠাতে হলে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। পড়ার কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেতাম, যেন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর

আসছে। কিছু করতেও পারছিলাম না, আবার ফিরিয়েও দিতে পারছিলাম না। ব্যাগের মুখ বন্ধ করে রেখে দিলাম খাটের নিচে।

কিছুদিন পর পর ইলিয়াস ভাই জিজ্ঞেস করেন—ভাই, কোন পর্যায়ে আছে? আমি বলি, মোটামুটি ভালো পর্যায়েই আছে। কাজ এগোচ্ছে।

দিন গড়াতে থাকে। চলে যায় চার মাস। লেখায় হাতই দেওয়া হয়নি। বইমেলা সামনে ছিল। তিনটি বইয়ের কাজ করছিলাম একসঙ্গে। তখন একদিন অনেক কাপড় ধুয়েছি। সে রাতে স্বপ্নে দেখলাম আব্বাকে। তিনি আমাকে বললেন, *'ও বাবা, তোমার এতগুলো পাঞ্জাবি ধুয়ে দিতে পারলে আর আমার হুজুরের কয়েকটা পাঞ্জাবি এতদিন ধরে খাটের নিচে ফেলে রাখলে! এগুলো একটু ধুয়ে দেওয়ার সময় পাও না তুমি?'*

ঘুম থেকে উঠে লক্ষ করলাম থরথর করে কাঁপছি। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়ে ১৫ দিন লাগিয়ে কাজ শেষ করে দিলাম। স্মারকগ্রন্থটির নাম দেওয়া হলো স্মৃতিচিহ্ন।

১ অক্টোবর ২০১৬, আব্বার সঙ্গে আমার দেখা হলো। আনন্দে কেঁদে ফেললাম আমি। দৌড়ে গেলাম তাঁর দিকে। তিনি ডান হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললাম, কোথায় চলে গিয়েছিলেন আব্বা?

তিনি হাসলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, কিছু খাবেন? খিদে পেয়েছে?

বললেন, খিচুড়ি নিয়ে আয়। খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। অনেকদিন হলো খিচুড়ি খাওয়া হয়নি...

আমি বললাম, আব্বা, আমার আহাফি পড়েছেন?

বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। আমি তো তোর এই বইয়ের কিছু অংশ পড়ে হাসতে হাসতে শেষ! নাজিরাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সে দেখেছে আমি বই পড়ে হাসছিলাম। তোর আরেকটা বই আসছে না? *মমাতি* নামে...

... ঘুম ভেঙে গেল আমার। টের পেলাম গাল তখনো ভেজা। অনেকক্ষণ একা একা কাঁদলাম। গভীর রাত, একা ঘর, কেউ কাছে নেই। বড় কষ্টের, বড় আনন্দের, বড় অন্যরকম ভালোলাগার কান্না ছিল সেটা। সিদ্ধান্ত নিলাম, *মমাতি* যদি প্রকাশ হয়, *মমাতি* নামেই হবে।

(নাজিরা আমার ছোটভাই মিসবাহর বউয়ের নাম। আব্বা তাঁকে দেখেননি। তিনি মারা যাওয়ার পরে সে বউ হয়ে আমাদের ঘরে এসেছে।)

মাওলানা জামিল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ

আমার বাবা। আমার আদর্শ। আমার অহংকার।

বাবা, আমি জানি আপনি আমাকে শুনছেন। এ জানার উৎস হলো বিশ্বাস। স্থির বিশ্বাস আমার—আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিশেষ ব্যবস্থায় আমার কথা শোনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আপনি আমাকে কতটুকু ভালোবাসতেন, সেটি আমি জানতাম; কিন্তু আমি আপনাকে কতটুকু ভালোবাসি, সেটি কি আপনি জেনে যেতে পেরেছিলেন?

সারণি

বিসমিল্লাহ	১৩
পৃথিবীর বয়স	১৫
সময় : একটি আন-নউন রিয়েলিটি	১৮
ঘুম কোমা ও মৃত্যু	২২
ঘুম মানে কী	২২
মৃত্যু কী	২২
কোমা	২৩
ঘুম যখন মৃত্যু	২৫
মৃত্যু যখন ঘুম	২৫
নতুন জামাই কেন	২৭
নবিদের ঘুম উম্মতের ঘুম	২৮
মানুষ কাকে বলে	২৮
নবি কীসের তৈরি	২৯
মাটির মানুষ	৩০
মাটির গুণ	৩২
জান্নাতি মাটি	৩৩
নাড়ির টান	৩৪
নবিগণ জান্নাতি মাটির	৩৫
নবিজি ও উম্মতের মধ্যে পার্থক্য	৩৬

হায়াত-মউত ৩৮
হায়াত কী ৩৮
মৃত্যু কাকে বলে ৩৯
মৃত্যু কীভাবে আসে ৪০
রুহ কীভাবে কবজ করা হয় ৪০
অসৎলোকের মরণের কষ্ট ৪৩

কবর জগত ৪৪
কবর কাকে বলে ৪৪
কবর কোথায় ৪৪
কবর যদি আকাশে হতো ৫১
কবর শরীরের না আত্মার ৫১
ফাউল প্রশ্ন ৫২

বারজাখ কাকে বলে ৫৪

মৃত্যুজয়ী জীবন ৫৮
নবি কাকে বলে ৫৮
বিশ্বনবির ইনতিকাল ৫৯
মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ৬০

কবরের আজাব ৬৭
আত্মার ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য ৬৮
চার দেয়ালের বেষ্টনী ৬৯
পঞ্চশক্তি ৭১
অন্ধ আত্মা, পঙ্গু শরীর ৭৩
হাদিসে জিবরিল ৭৪
মমাতিদের প্রশ্ন ৭৪
জিবরাইল না জিবরিল ৭৬
জাহিলি এশকালাত ৭৬
ফালতু প্রশ্নের শেষ থাকে না তাদের ৭৭
ইনসান প্রটোকল ৮০

কেমন আছেন নবিজি ৮৪
নবিজি কি উম্মতকে দেখেন ৮৪
নবিজি জবাব দেন ৮৫

হায়াতুন নবি ৮৭
শহিদগণের শরীর অক্ষত ৮৯
একটি অন্তর্নিহিত প্রশ্নের জবাব ৯৪
শহিদগণকে খাবার দেওয়া হয় ৯৪
লা তাকুলু, লা তাহসাবান্না ৯৬
ইনদা রাব্বিহিম য়ুরজাকুন ৯৮
রুহুল্লাহ ও আল্লাহর উটনী ১০০
কবর থেকে সুপারিশ ১০৩
কবরপাড়ের কাহিনি ১০৪
মাসকান মানে কী ১০৭
আনতা ফিহিম ১০৮
মায়ের সঙ্গে বিয়ে ১০৯
সাহাবিগণের তিন অবস্থা ১১৩
ইদ্দতে উম্মাহাত ১১৪
ওয়ারিসানে নবি ১১৪
নবির কেন ওয়ারিস হয় না ১১৫
নবির রেখে যাওয়া সম্পদ সাদাকা কেন ১১৬
নবি যখন সাক্ষী ১১৬
৩০৯ বছরের ঘুম ১১৮
লজ্জাবতী ১১৯
কবরপাড়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা ১২০
দুরুদ আমরা কেন পড়ি, কোথায় যায় ১২১
কবরে নামাজ পড়া ১২২
নবিগণ কবরে নামাজ পড়েন ১২৪
কাছের সালাম দূরের দুরুদ ১২৭
রাওজাপাড়ে ইসা নবি ১২৯

উম্মতের সালাম, নবির জবাব ১২৯
ঘুমের মানুষ কি শোনে ১৩০
জাতির উদ্দেশে আবু বকরের ভাষণ ১৩২
মাইয়িতুন দুইবার কেন ১৩৩
হুজুরের জানাজা ১৩৪
মুনকিরিনে হায়াত ১৩৫
হায়াতুন নবি অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ফকিহগণের মতামত ১৩৭
হায়াতুন নবির লৌকিক অলৌকিকতা ১৪৬

বিসমিল্লাহ

পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর নবিজি কবরে সশরীরেই জীবিত, এই আকিদার নাম আকিদায়ে হায়াতুন নবি। হায়াতুন নবির আকিদা ইমানের অনুষঙ্গ। বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ সকল যুগের। সুতরাং তাঁকে সর্বযুগেই বেঁচে থাকা লাগবে।

পুরো গ্রন্থে তিনটি শব্দ নিয়েই কথা বলব আমরা—**নবি**, **হায়াত** ও **আকিদা**। এই তিন শব্দ ভালো করে বুঝতে পারলে হায়াতুন নবি বিষয় নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না, সবকিছু পানির মতো স্বচ্ছ লাগবে। তার আগে মমাতি বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা দরকার।

আমরা হলাম হায়াতি। হায়াতি নামটি আমাদের ওরাই দিয়েছে। ওরা মানে আমরা যাদের নাম দিয়েছি মমাতি। নবিজির কবরজগতের হায়াত স্বীকার করি বলে আমরা হায়াতি। তারা হায়াত মানে না, এ জন্য তারা মমাতি। মমাতি আহাফিদেরই একটা অফশুট। সব মমাতি আহাফি নয়; কিন্তু সব আহাফিই মমাতি। এক রসুনের কোষ।

গ্রন্থটিতে চেষ্টা করা হয়েছে সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সহজ করে ব্যাখ্যা করতে। আর এ ক্ষেত্রে আমাকে আবারও সহায়তা করলেন মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিজাহুল্লাহ। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। চমৎকার সঙ্গ পেয়েছি হুজ্জাতুল্লাহি ফিল আরজ, মাওলানা কাসিম নানুতুবির *আবে হায়াত* থেকে।

দলিল ঘাঁটাঘাঁটিতে বরাবরের মতো সঙ্গ দেওয়ায় হাফিজ মাওলানা নোমান আহমদের কৃতজ্ঞতা। প্রুফ রিডিংজনিত মেহনতের জন্য কালান্তর টিমকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আবুল কালাম আজাদকে, *মমাতি*র নতুন সংস্করণ প্রকাশের

উদ্যোগ গ্রহণ করায়। এবং স্বকৃতজ্ঞ স্মরণ বন্ধুবর হাফিজ মাওলানা আহমাদ আবু সুফিয়ানকে, কোনোরকম বাণিজ্যিক ভাবনা ছাড়া শুধু লেখক এবং লেখার প্রতি ভালোবাসার কারণে ২০১৭-তে *মমাতি* প্রথম প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আল্লাহপাক তাঁকে জাজা ফিদ-দারাইন দান করুন।

এবং বরাবরের মতো এবারও বলি, যেহেতু এটি 'জালিকাল কিতাব' নয়, এ জন্য 'লা-রাইবা ফিহ' বলার ক্ষমতাও আমার নেই। ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। দেখিয়ে দিলে সংশোধন করা হবে। আল্লাহ তাআলা লেখক-প্রকাশক-পাঠক, সবাইকে নবিজির ভালোবাসার পাত্র হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

পৃথিবীর বয়স

পরিবেশ-বিজ্ঞানীগণ জানিয়েছেন পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। এর মানে, আমাদের অতীত সাড়ে ৪০০ কোটি বছরের। ভবিষ্যৎ কত বছরের আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান কত বছরের? কত দিনের? অন্তত কত সেকেন্ডের?

আচ্ছা, কাল তো তিন প্রকার। সেই ছোটবেলায় মুখস্থ করেছি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল। কিন্তু হিসাব তো মিলে না! আমি যখন 'বর্তমান' শব্দটি উচ্চারণ করতে যাই, তখন বর্তমানের 'ব' বলার পর 'ত' এর রেফ উচ্চারণ করার আগেই 'ব' চলে যায় অতীতে, 'ত' থাকে ভবিষ্যতে। এত কম সময়, এক মাইক্রো সেকেন্ডেরও কম সময় একটি কাল হয় কীভাবে!

এখন আমি যদি বলি, কাল আসলে দুই প্রকার—অতীত ও ভবিষ্যৎ। 'বর্তমান' বলে কোনো কালের অস্তিত্বই নেই। সময়ের সমষ্টির নাম কাল। সুতরাং সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ থেকেও কম সময়কে একটি 'কাল' বলতে আমি রাজি না, তাহলে কেমন হবে অবস্থা?

আচ্ছা, অবস্থা যেমনই হোক, পরে দেখা যাবে। আপাতত কথা হোক হায়াতুন নবি নিয়ে।

হায়াত মানে জীবন। জীবনের সঙ্গে মরণ যুক্ত। জীবন বললে মরণের কথাও চলে আসে। সঙ্গে আসে হায়াত-মউতের উপ-আনুষঙ্গিকতা। তাই নবিজির হায়াত বোঝার জন্য প্রথমে আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয় বোঝা লাগবে। যেমন : ঘুম কাকে বলে, মৃত্যু মানে কী, কোমা কেমন অবস্থার নাম, ঘুম ও মৃত্যুতে সামঞ্জস্য কী, নবিজি ও উম্মতের জীবনে কোনো ব্যবধান ছিল কি না ইত্যাদি। এগুলো না বুঝলে হায়াতুন নবির মতো স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম বিষয় বোঝা কঠিন হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সুস্থ মস্তিষ্কের সকল মুসলমান একমত, মুহাম্মাদ ﷺ মদিনায় নিজের কবরে সশরীরে জীবিত আছেন। কিন্তু মুসলমান নামধারী কিছু কপালপোড়া

আছে, যাদের আকিদা—বিশ্বনবি কবরে জীবিত নয়! এদের কারও কারও নামের আগে আবার রকমারি টাইটেলসহ 'মাওলানা' লাগানো। আমি ভাবি, এই যদি হয় মাওলানার অবস্থা, তাহলে জাহিল ও নাদানের সংজ্ঞা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। আমার তো মন চাচ্ছে বলি, মুসলমান দাবি করেও যারা বিশ্বনবির হায়াতকে স্বীকার করে না, এক অর্থে তারা বর্বর সেই ইয়াহুদি থেকেও নিকৃষ্ট, যারা মদিনার কবর থেকে বিশ্বনবির লাশ চুরি করার পরিকল্পনা করেছিল। আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জেরুসালেম-বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির গুরু সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি (১১১৮-১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) যাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এবং নবিজির রাওজার অনেক নিচ পর্যন্ত সিসা ঢালাই করে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষাপ্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

হায়াতুন নবির অস্বীকারকারীদের এই অর্থে আমার আরও জঘন্য কথা বলতে ইচ্ছা করছে যে, ওই ইয়াহুদিরা পর্যন্ত বিশ্বাস করত—নবিজি কবরে সশরীরে জীবিত আছেন—তবেই-না কবর থেকে লাশ চুরির পরিকল্পনা করেছিল। মমাতিরা তো তা-ও স্বীকার করে না!

আজীবন-আমরণ

জীবন মানেই মৃত্যু। মৃত্যু মানে জীবন।

এটা আবার কেমন কথা! জীবন-মরণ সমান হয় কী করে?

হয়। একটা পর্যায়ে একটা প্রক্রিয়ায় জীবন-মরণ সমানই হয়ে যায়। কীভাবে হয় পরে বলছি, তার আগে জীবনের পরিধি একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

পড়ন্ত বিকেল সূর্যাস্তের জন্য আদর্শ সময় নয়। সূর্যাস্ত হবে শেষ বিকেলে, এটাই প্রকৃতির বেঁধে দেওয়া নিয়ম। এর ব্যতিক্রম ঘটা মানে অস্বাভাবিক কিছু, তবে হতে পারে। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। মানুষ চেষ্টা করে রহস্যের ফসকাগেরো খুলতে। ব্যর্থ হয়। আবিষ্কার করে আরও বজ্র-আঁটুনি। প্রকৃতি চায় না মানুষ রহস্যের সব জানালা খুলে ফেলুক। তবু অমীমাংসিত রহস্যের পেছনে মানুষের বিরামহীন ছুটে চলা। আজীবন-আমরণ।

মৃত্যু একটি কঠিন সত্য। মৃত্যুর উৎসবিন্দু হচ্ছে বিশ্বাস। মৃত্যুকে যারা কাছে থেকে দেখেছে, তারা কেউ আর ফিরে আসেনি। সুযোগ ছিল না। সংগত কারণেই 'মৃত্যু' ব্যাপারটি নিয়ে মানুষের কৌতূহল স্বভাবজাত। যতই *লাইফ আফটার ডেথ* বই

লেখা হয়ে যাক, 'কোমা' ও 'মৃত্যু' তো আর এক কথা নয়।

মৃত্যুকে যদি স্মৃতিতে ধারণ করার সুযোগ থাকত, তাহলে জানা যেত মৃত্যুর স্বরূপ। আচ্ছা, স্মৃতি মানে যদি হয় মস্তিষ্কের নিউরোন সেলে জমাটবাঁধা অতীতের খণ্ডচিত্র, তাহলে সেটাকে ভবিষ্যতের ভাবনায় রাখার জন্য প্রয়োজন বর্তমান নামক একটি আয়না। কিন্তু আমরা তো বর্তমান বলে কোনো 'কাল'ই খুঁজে পেলাম না! তাহলে কীভাবে কী হবে?

ভালো কথা। আমরা কি জানি, আয়নায় যে ছবি দেখা যায় সেটা মূলত ছবি নয়। কাইন্ড অব প্রতিচ্ছবি বলা যায়। ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সহজ পন্থা বলে দিই। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ডান হাত উঁচিয়ে দেখুন আয়নার দিকে। আয়না আপনাকে দেখাবে আপনি বাম হাত উঠিয়েছেন!

আজীবন-আমরণ নিয়ে কথা হচ্ছিল।

জীবন মানে বেঁচে থাকা। মরণ মানে জীবনের অবসান। এই অর্থে জীবনের বিপরীত শব্দ ধরা যায় মরণকে। এবার দুটোর আগে একটি 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করি। তাহলে দাঁড়াল আজীবন ও আমরণ। আজীবন মানে সারা জীবন, মানে মরার আগ পর্যন্ত। আমরণ মানেও তো মরার আগ পর্যন্ত। তাহলে জীবন-মরণে ব্যবধান কোথায়?

শূন্য থেকে শুরু জীবন পুণ্যে গিয়ে শেষ
অথবা নতুন করে শুরু,
জাহান্নামের যন্ত্রণা আর ফিরদাউসি কলকাকলি
রক্ষা করো গুরু।

হায়াতুন নবি ﷺ আমাদের আলোচ্য। হায়াত মানে জীবন। জীবন মানে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের সমষ্টি; কিন্তু সময় কাকে বলে?

সময় : একটি আন-নউন রিয়েলিটি

বিজ্ঞান-বাজারে সময় সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ পাওয়া যায়। স্যার আইজ্যাক নিউটনের তত্ত্বমতে সময় হলো, মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ, যেটি এক বিশেষ মাত্রা এবং যেখানে ভৌত-ঘটনাসমূহ একটি ক্রমধারায় ঘটে। এই মতানুসারে সময় একটি ভৌত রাশি, যা পরিমাপযোগ্য।

হিন্দুমতে, সময় চার ভাগে বিভক্ত। তারা বিশ্বাস করেন চার যুগে :

১. সত্য যুগ,

২. ত্রেতা যুগ,

৩. দ্বাপর যুগ ও

৪. কলি যুগ।

তাদের মতে, এই বিশ্বের জন্য সময় কোনোদিনও শেষ হয় না এবং শুরুও হয়নি। সময় জন্ম নেয়নি শেষ হওয়ার জন্য, আবার শেষ হবে না জন্ম নেওয়ার জন্য। তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কাজ করছে তাদের ঈশ্বরতত্ত্ব। হিন্দুমতে, সময় ঈশ্বরের একটা অংশ; কিন্তু ঈশ্বর সময়ের মধ্যে থাকেন না। সময় শুরু হয় যখন ঈশ্বর সবকিছু চালু করেন এবং শেষ হয় যখন তিনি এটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন; আর এটাই হচ্ছে অচল হওয়ার সময়। ঈশ্বর সময়ের বাইরে; কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের ভেতরেই আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেভাবেই পরিচালিত হয়।

সময় সম্বন্ধে সময়ের স্রষ্টা আল্লাহ কী বলছেন!

কাফিররা মনে করত, জীবন-মৃত্যু এটা সময়েরই কাজ। আল্লাহর কোনো আদেশ ও ইচ্ছার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। তারা সময় বা মহাকালকে দোষারোপ করত, যার বিবরণ পাওয়া যায় কুরআনে—

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই শেষ। আমরা মরি ও বাঁচি। মহাকালই আমাদের ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। [সুরা জাসিয়া : ২৪]

কাফির ও মুশরিকরা কালের আবর্তনকেই সমগ্র সৃষ্টিজগত ও তাদের যাবতীয় অবস্থার হেতু আখ্যা দিচ্ছিল এবং সেটার দিকেই সম্পর্কিত করছিল। যেমনটি উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এ সবকিছু মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায়ই হয়। আর এ জন্যই ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি*তে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদিসে কুদসি এনে বলার চেষ্টা করেছেন, সময়ই আল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহর সহজাত একটি কুদরত।

*বুখারি*র ভাষ্য—হাদিসে কুদসি—আল্লাহ বলেন,

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আদমসন্তান আমাকে কষ্ট দেয় (অর্থাৎ, এমন কাজ করে, যা আল্লাহর পছন্দ নয় এবং যেসব কাজের কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন)। তারা সময়কে গালি দেয়; অথচ আমিই সময় (এর সৃষ্টিকর্তা)। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।

অবিশ্বাসীরা যে শক্তিকে (دهر—দাহর) বা কাল শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহরই। আর তিনিই কালের সৃষ্টিকর্তা। এ জন্য কালকে মন্দ বলার ধাক্কা সরাসরি আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে লাগে।[১]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

হিন্দুয়ানি বিশ্বাসে মহাবিশ্বকে সংস্কৃত ভাষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। বাংলাতেও এর ব্যবহার আমরা পাই। এ-সংক্রান্ত চমৎকার একটি লোককাহিনি আছে। সেটা হলো, একবার ব্রহ্মা কৌতূহল থেকে একটি প্রতিকৃতি সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা হলো ভগবানের অপর নাম। প্রতিকৃতি বানানোর পর একসময় সেটা তার পছন্দ হয়ে গেল। তিনি সেটির ভেতরে প্রাণের সঞ্চার করলেন। প্রাণ পেয়ে প্রতিকৃতিটি এক

[১] *কাশফুল বারি শারহু সাহিহিল বুখারি* : ১৮/৪৩৭।

মেয়ের রূপ ধারণ করল। তিনি মেয়ের নাম দিলেন শতরূপা। শতরূপা একসময় অপরূপা হয়ে উঠল। ব্রহ্মা তার সৃষ্ট কন্যার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়লেন। শুরু হলো লীলাখেলা। একপর্যায়ে কন্যা শতরূপা গর্ভবতী হয়ে পড়ল। ৬ হাজার বছর গর্ভধারণের পরও যখন শতরূপার সন্তান প্রসবের কোনো আলামত দেখা গেল না, ব্রহ্মা তখন রাগ করে মর্ত ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

কেটে গেল ৬ হাজার বছর। এর মধ্যে একবার এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। নাহ, প্রসবের কোনো নামগন্ধ নেই! কোনো মানে হয়!

১২ হাজার বছর পর শতরূপার প্রসববেদনা শুরু হলো। শুধু ব্যথা আর ব্যথা; কিন্তু সন্তান ভূমিষ্টের লক্ষণ নেই! ৬ হাজার বছর প্রসববেদনায় ছটফট করল শতরূপা। একপর্যায়ে অপেক্ষার অবসান ঘটল। ভূমিষ্ট হলো সন্তান। স্বর্গে অবস্থান করা ব্রহ্মার শরীরে মৃদু কম্পন অনুভূত হলো। তিনি বুঝতে পারলেন শতরূপা সন্তান প্রসব করেছে। খুশিতে টগবগ করে স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এলেন তিনি। নিজের সৃষ্ট কন্যার গর্ভে নিজের সন্তানের মুখ দেখার জন্য ভগবান ব্রহ্মার তর সইছিল না।

সন্তানের চেহারার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সব আগ্রহ উবে গেল তার। এতদিনের ভালোবাসার ফসল এমন হবে, এটা তার কল্পনাতেও ছিল না! তিনি দেখলেন, শতরূপা একটি বিশাল আকৃতির আন্ডা প্রসব করেছে! ১৮ হাজার বছর অপেক্ষার পর একটি আন্ডা—মেজাজ ঠিক থাকার কথা?

ভগবানের মেজাজ বিগড়ে গেল। প্রচণ্ড রেগে আন্ডায় দিলেন এক লাথি। আন্ডা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে অর্ধেক উপরের দিকে উঠে গেল, অর্ধেক পড়ে থাকল নিচে। যে অংশ উপরের দিকে গেল, তা দিয়ে সৃষ্টি হলো আসমান। যা নিচে পড়ে থাকল, তা দিয়ে জমিন।

ব্রহ্মা মানে ভগবান, অণ্ড বা আন্ডা মানে ডিম। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানে ব্রহ্মার বা ভগবানের আন্ডা। ব্রহ্মার আন্ডা থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, তাই মহাবিশ্বের নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এরপরে মহাবিশ্বকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলা কতটা সঠিক হবে, ভেবে দেখা দরকার।

উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা দুজন আলাদা ব্যক্তি। ব্রহ্মা হলো সৃষ্টিকর্তার নাম। ব্রহ্ম আলাদা, তিনি পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের মোট তিন রূপ। সেগুলো হলো, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর শিব ধ্বংসকর্তা। তিনজন মিলে সৃষ্টি আর ধ্বংস করে চলেছেন—এগুলো বাজারে প্রচলিত অথবা প্রচারিত কথা। হিন্দু

ধর্মাবলম্বীদের মৌলিক বিশ্বাসের অংশ কি না কে জানে!

সময় নিয়ে সময়ে-অসময়ে গবেষণা কম হয়নি। গবেষণা চলমান। এখনো কেউ সময়ের সঠিক পরিচয় খুঁজে বের করতে পারেননি। মনে হয় না পারবেন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন 'আমিই সময় বা কাল'। অর্থাৎ, সময় আল্লাহর রহস্যময় এক সৃষ্টি। আল্লাহ আত্মা সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি মানুষের ভেতরে একটি করে আত্মা দিলেন। আত্মা আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে; অথচ কেউ জানে না আত্মার স্বরূপ!

সময়ের আবর্তনেই আমাদের বেঁচে থাকা। সময় চলছে প্রতিনিয়ত; অথবা সময় স্থির, আমরা চলমান। কিন্তু নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না 'সময়' কী! বলবেই-বা কীভাবে! সময় তো আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শন। আল্লাহকে দেখতে চাও? আল্লাহর নিদর্শন দেখো। কিছু নিদর্শন এমনও দেখো, যেগুলো দেখা যায় না। এ থেকে শিক্ষা নাও—আল্লাহর নিদর্শন দেখলে তো মানবেই, না দেখলেও মানতে হবে। না দেখলেই প্রমাণিত হয় না যে, বাস্তবেও নেই। যেমন আত্মা। যেমন সময়। যেমন অন্যান্য।

ঘুম কোমা ও মৃত্যু

আমাদের আলোচ্য বিষয় হায়াতুন নবি। সে দিকেই যাচ্ছি। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য একটি ছক দাঁড় করানো লাগছে। হায়াত-মউত, ঘুম-কোমা—এই চারটি বিষয় আমাদের সামনে খুব পরিষ্কার থাকতে হবে। জীবন বোঝার জন্য মৃত্যু। আবার ঘুম হলো মৃত্যুর আপন খালাতো বোন। সুতরাং ঘুম ও মৃত্যুর কম্বাইন রিলেশনের ব্যাপারটি বুঝে ফেললে হায়াতুন নবি বুঝতে সমস্যা থাকবে না।

ঘুম মানে কী

ঘুম হচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তাঁর স্বাভাবিক সচেতন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্তিমিত থাকে। সমস্ত স্তন্যপায়ী, পাখি, বহু সরীসৃপ, উভচর ও মাছের মধ্যে ঘুমানোর প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। মানুষ ও অন্য কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিয়মিত ঘুম দরকার।

ঘুমানোর কারণ বিজ্ঞানীগণ এখনো পুরোপুরি জানতে পারেননি মর্মে তারা আমাদের জানিয়েছেন। কেন পারছেন না বোধগম্য নয়। হাতের কাছেই কুরআন ছিল। আল্লাহ বলছেন,

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾

তোমাদের ঘুমের মধ্যে আল্লাহ প্রশান্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। [সুরা নাবা : ৯]

তার মানে, প্রশান্তিই ঘুমের উদ্দেশ্য। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিই ঘুমের প্রধানতম কারণ।

মৃত্যু কী

জীববিজ্ঞানের ভাষায় মৃত্যু মানে জীবনের সমাপ্তি। প্রাণ আছে এমন জৈবপদার্থের